ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

মার্চ ২০১৪

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

এম. হাফিজউদ্দীন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধানে

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা সহকারি
ছালেহ মুহাম্মদ শাহরিয়ার, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

বিশেষ সহযোগিতায়
সাধন কুমার দাস, শরীফ আহমেদ চৌধুরী, নাজমুল হুদা মিনা

সম্পাদনা ও পরিমার্জনা
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, মো. ওয়াহিদ আলম, সাধন কুমার দাস, মো. রেযাউল করিম

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ[১]

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই খাদ্যে ভেজালের বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, খাবার জাতীয় কোনো পণ্যই এখন নিরাপদ নয়। শাকসব্জী, মাছ-মাংস থেকে শুরু করে ফলমূলসহ নিত্যদিনের খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের প্রয়োগ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ও জীবনহানির ঘটনা ঘটে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়[২] এবং প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ডাইরিয়ায় আক্রান্ত রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিরাপদ খাদ্য ও পানি।[৩] জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে মোট ২১,৮৬০টি বিভিন্ন ধরণের খাদ্য পণ্যের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৫০ ভাগে ভেজাল রয়েছে[৪]।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত খাদ্যপণ্যে ভেজাল জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেজাল খাবার গ্রহণ করে মানুষ যেসব মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে তার চিকিৎসা ব্যয় অত্যধিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা লাগে বা আজীবন চিকিৎসা করতে হয়। এতে জনগণের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় অনাকাংখিত চিকিৎসা ব্যয়ে। সম্প্রতি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা ভেজাল প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ, এফবিসিসিআই ও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন জেলার মোট ১৮টি কাঁচাবাজারকে ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে একটি স্বতন্ত্র খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে এ সকল উদ্যোগসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়, কারণ খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি প্রতিবছরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ফলে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ভেজাল খাদ্যের ব্যপকতা অব্যাহত থাকে। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ করলেও ভেজালকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্যের ব্যাপকতা, খাদ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গবেষণা হলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করা ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনা করা

[১] ২০১৪ সালের ২০ মার্চ ঢাকার হোটেল অবকাশ এ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।
[২] http://www.fao.org/asiapacific/bangladesh/home/en/ (accessed on 14 november 2012)
[৩] http://www.ban.searo.who.int/en/Section3/Section40/Section104.htm (accessed on 14 november 2012)
[৪] জনস্বাস্থ্য ইনস্টিউট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান আইনি কাঠামো, প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা ও পরীক্ষাগার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত উপাদানগুলো সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সেবার মান ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্ম পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় ৬টি (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ, মোবাইল কোর্ট) প্রতিষ্ঠান ও ৪টি পরীক্ষাগারকে (পিএইচএল, পিএইচএফএল, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও সময়কাল

গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হল- সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোর মহাপরিচালক, পরিচালক, কাস্টমস কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ক্যাব প্রতিনিধি, বন্দর প্রতিনিধি, সিএন্ডএফ এজেন্ট, মৎস্য, শাক-সবজি ও ফল ব্যবসায়ী, আড়তদার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (সংশোধনী ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তক ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - মার্চ ২০১৪ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

২. নিরাপদ খাদ্য তদারকির আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তিনটি আইন- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এই তিনটি আইনের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হল:

২.১ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বলবৎ না করা

এ আইনটি ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর প্রণয়ন করা হয়। আইনের ১(২) ধারায় সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বলবৎ করার বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত আইনটি বলবৎ করার জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয় নি।

২.২ ভোক্তার সরাসরি মামলা করার বিধান না থাকা ও ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা

ভোক্তা কোনো খাবার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুস্থ হলে বা কোনো খাবারে ভেজাল বলে সন্দেহ হলে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ [৪১(ক)ধারা] ও ভোক্তা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (৬০ধারা) এ সরাসরি মামলা দায়ের করার বিধান রাখা হয় নি। এক্ষেত্রে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলে আইনি পদক্ষেপ নিবেন। মামলা করার ক্ষেত্রে এসকল প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে অনেকসময়ই ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অভিযোগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২.৩ নিরাপদ খাদ্য আইনে সরাসরি মামলা করার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৬(৩)[৫] ধারায় সরাসরি মামলা দায়েরের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভেজাল খাদ্য গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে হয়ে থাকে। এরফলে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

২.৪ প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠন না হওয়া

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ [৪১(১)[৬]] এ দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত (প্রয়োজনে একের অধিক) গঠনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধ শতকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও দেশের প্রতিটি জেলা ও

৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৬(৩) ধারায় বলা হয়েছে, এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যেকোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

মহানগরে খাদ্য আদালত গঠিত হয় নি। উপরন্তু দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনের বিষয়ে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের আদেশও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সারা দেশের মধ্যে একমাত্র ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি মাত্র খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনের বিধান রাখা

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত গঠনের উল্লেখ থাকলেও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৬৪(১)][৭] তে শুধুমাত্র 'প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন বলবৎ হলে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠনের বাধ্যবাধকতা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৬ ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বাধ্যবাধকতা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৬২(৩) ধারা ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৭৩(৩) ধারায় ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ ও প্রক্রিয়াগত জটিল হওয়ার কারণে আইনের এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় ভোক্তা তার অভিযোগ দায়েরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

২.৭ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না থাকা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাজার পরিদর্শণ ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়নি। আইনে বলা হয়েছে মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্যকোনো সরকারি কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষার্থে বা পালনে তাদের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি। এর ফলে অনেকসময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করে।

২.৮ খাদ্যপণ্য পরিদর্শনে পরিদর্শকদের আইনি সীমাবদ্ধতা

মাঠপর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের আওতা আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা শুধুমাত্র বাংলাদেশ পিওর ফুড রুলস ১৯৬৭ তে উল্লেখিত ১০৭ ধরনের খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করতে পারে। অপরদিকে বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ফিল্ড অফিসারদের কার্যক্রম ৫৮টি শিল্পজাত খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে অনেক খাদ্যপণ্য পরিদর্শনের বাইরে থেকে যায়।

২.৯ বিভিন্ন আইনে কঠোর শাস্তিদণ্ডের অভাব

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর শাস্তি ও জরিমানার ধরণ বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহতা, অপরাধ সংগঠনকারীদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় জরিমানা ও শাস্তির পরিমান কম। উদাহরণস্বরূপ- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) এ সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। নতুন প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে জরিমানা ও শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করে অনুর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান করা হলেও এখানে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয় নি। অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে ভারতে যাবজ্জীবন,পাকিস্তানে ২৫ বছর কারাদণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

২.১০ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যহত থাকা

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত বা নিম্ন আদালতে ক্ষেত্র বিশেষে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্যণীয়। সাধারণত স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা নিম্ন আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্ট- বিবাদি পক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এক্ষেত্রে আসামি সশরীরে কোর্টে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবি নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করে। নিম্ন আদালত হতে প্রাপ্ত এ সুযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়শ বিবাদি বড় কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে দাবি করে বাদি পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালত

---

৬ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৪১(১) ধারায় বলা হয়েছে, The Government may, by notification in the official gazette, establish one or more pure food court, as it considers necessary, in each district and metropolitan area for the purpose of this ordinance.

৭ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে

বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণদর্শাও নোটিশ প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। বিবাদি পক্ষের এ মামলার প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেকসময়ই ৬ মাস থেকে ২ বছর অথবা আরো দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেকসময় উচ্চ আদালত রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদিপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শণসহ নমুনা সংগ্রহের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। এর ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন অব্যহত রাখে।

৩. খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে অংশীজনের সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.১ নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সুনির্দিষ্টভাবে পদ না থাকা

নিরাপদ খাদ্যের নজরদারিতে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৃথক বা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়-দায়িত্বের একটি অংশ হিসেবে এ কাজটিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দায়-দায়িত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায় নিরাপদ খাদ্যের তদারকিমূলক কাজ ছাড়াও তাদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ করতে হয়। এসকল কাজে তারা প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। এর ফলে তাদের কাছে নিরাপদ খাদ্যের তদারকির কাজটি গৌণ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩.২ জনবলের স্বল্পতা

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিএসটিআই) কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি কর্পোরেশনে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৩৭০টি স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭৮ জন কর্মরত আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সারা দেশে ৫৬৬ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকলেও তাদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিবেচনায় এই জনবল যথেষ্ঠ নয়। অপরদিকে ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহরের বিএসটিআই এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় ফিল্ড অফিসারের ৬৮টি অনুমোদিত পদ রয়েছে কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ৩৮ জন। মাঠ পর্যায়ে এ সকল পদসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল স্বল্পতার কারণে নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এর ফলে বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা (প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা, খাদ্যের বাজার) অপরিদর্শিত থেকে যায়।

৩.৩ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি ও পদোন্নতিতে সমস্যা

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি লক্ষণীয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ার কারণে নিজ দপ্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক, বাজার পরিদর্শনে খাদ্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার কর্তৃক এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য প্রসিকিউটিং এজেন্সির কর্মকর্তা দ্বারা অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে। এরফলে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে সার্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের সুষ্ঠু তদারকি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের বিভাগীয়ভাবে পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই। উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা পদোন্নতির মাধ্যমে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে উন্নীত হলেও তাদের শুধুমাত্র বেতন স্কেলে পরিবর্তন হয় কিন্তু পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণীতেই থেকে যায়।

৩.৪ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও প্রশিক্ষন প্রাপ্তিতে অনিয়ম

নিরাপদ খাদ্য তদারকির বিভিন্ন সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ যেমন- ফুড হ্যান্ডলিং প্রাকটিস, ইন্ডাসট্রিয়াল হাইজিন, কমিউনিকেবল ডিজিজ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চেইনের সমসাময়িক তথ্যাদি সম্পর্কে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সীমিত। এর ফলে তারা মাঠ তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রমের সকল নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। আবার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতেও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না এবং এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সুসম্পর্ক, যোগাযোগ ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৫ খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব

খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব রয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্যের প্রাথমিক মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিটস (স্যাম্পলিং স্পুন, সারফেস থার্মোমিটার, ফরমালিন টেস্টিং কিট, পিএইচ মিটার ইত্যাদি) এর অভাব রয়েছে। এছাড়া স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের বাজার মনিটরিং করার জন্য দাপ্তরিকভাবে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে বাজার পরিদর্শনে তাদেরকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

৩.৬ পরিদর্শন গাইডলাইন ও ম্যানুয়াল এর অভাব

বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শন গাইডলাইন থাকলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও পরিদর্শন ম্যানুয়াল নেই। এর ফলে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথিব্যবস্থার দুর্বলতা লক্ষণীয় এবং এক্ষেত্রে তারা কোনো একক পদ্ধতি অনুসরণ করে না। এর ফলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা তৈরী হয়।

৩.৭ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের সমস্যা

মাঠপর্যায়ে পরিদর্শকরা খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা কাঠামোবদ্ধ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে না। তারা সাধারণত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুমানের ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ করে থাকে। নমুনা সংগ্রহের পর তা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট জায়গা ও ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের তথ্য মতে, শুধুমাত্র সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, মোড়কজাতকরণ ও দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত নমুনার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বাতিল হয়।

৩.৮ খাদ্য তদারকি কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে পৃথক কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। তাদেরকে মাঝে মাঝে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা জেলা সিভিল সার্জন অফিসের কন্টিনজেন্সি ফান্ড হতে খুবই স্বল্প পরিমাণে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং তা অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিসের মোট কন্টিনজেন্সি বাবদ মাসিক বরাদ্দ ২০০০ টাকা।

৩.৯ মাঠ পর্যায়ে অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকা ও মামলা পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনজণিত মামলা পরিচালনার জন্য বিএসটিআই এবং কিছু পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এক্ষেত্রে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিজেকেই কোর্টে মামলা উপস্থাপন করতে হয়। বিবাদি পক্ষের আইনজীবি পেশাদার হওয়ার কারণে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা অনেকসময় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারে না। আবার আাইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদেরকে অনেকসময় খাদ্য স্থাপনা বা খাদ্যব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা অনেকসময়ই এ সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে যোগসাজস করে থাকে। এর ফলে অনেকসময় নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না।

৩.১০ মাঠ পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা কাঠামোয় দ্বৈততা ও ঘাটতি

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় দ্বৈততা ও ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে উপজেলা পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার কাছে জবাবদিহিতা ব্যবস্থা রাখা হয়নি। উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জবাবদিহিতা সরাসরি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। আবার জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর উভয় পদ তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ায় তাদের মধ্যে কার্যকরভাবে জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। জবাবদিহি ব্যবস্থার দ্বৈততার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দায়-দায়িত্ব পালনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত না করে পরিদর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

৩.১১ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও যোগাযোগের অভাব

নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধুমাত্র আইনিভাবে তাদের কর্ম এলাকা নির্ধারণ, মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয় থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে একে অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা লক্ষণীয়; এর ফলে প্রকৃত অর্থে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও প্রসিকিউটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। অনেকসময় জেলা প্রশাসন হতে নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রসিকিউশন কর্মকর্তারা ফিল্ডে হাজির হলেও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যস্ততা বা অনুপস্থিতির কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয় না এবং এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অফিস হতে অনেকসময় তাদেরকে সময়মত অবহিত করা হয় না।

৩.১২ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাব ও নিরাপত্তার ঝুঁকি

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহযোগীতার অভাব লক্ষ করা যায়। অনেক সময় জেলা প্রশাসন অফিসে মোবাইল কোর্ট টিম প্রস্তুত থাকলেও পুলিশী সহায়তা না পাওয়ার কারণে তারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বের হতে পারে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিরাপত্তার ঝুঁকি লক্ষণীয়। অনেকসময় মোবাইল কোর্ট টিমকে বাজারের দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা ঘেরাও করে এবং তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে টিমের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য না থাকলে তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং সার্বিকভাবে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম ব্যহত হয়।

৩.১৩ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তদারকির গুরুত্ব কম হওয়া

বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অংশীজনের বেশিরভাগই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর ফলে তাদের কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত পর্যায়ে খাদ্য ও খাবারের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অর্থাৎ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রম জোরদার করা। বাংলাদেশে খাদ্য তদারকি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে খাবার টেবিল (from farm to table) পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থাকে (entire food chain) প্রতিফলিত করে না

৩.১৪ আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা

দেশের বিভিন্ন বন্দরে কাস্টমস হাউজ কর্তৃক আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা লক্ষ্যণীয়। এগুলো হলো- আইপিও অনুযায়ী জাহাজ বহির্নোঙ্গর থাকা অবস্থায় খাদ্যপণ্যের স্পেশাল এপ্রেইজমেন্ট করার নিয়ম থাকলেও তা না করে জেটিতে খাদ্যপণ্য খালাসের পর করা হয়। আবার নমুনা সংগ্রহকালীন সকল প্রতিনিধির (কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারকের প্রতিনিধি ও জাহাজের মাষ্টার) উপস্থিতির কথা বলা হলেও সকল ক্ষেত্রে এ উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় না ও অনেক সময় আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং নমুনা সংগ্রহে আদর্শ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। আবার খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রেও অনিয়ম লক্ষ্যণীয়। আইপিও অনুযায়ী পরীক্ষাগারের প্রতিনিধি কর্তৃক কাস্টমস হাউজের নমুনা রুম হতে দিনে দুইবার অর্থাৎ সকাল ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করার বিধান থাকলেও তা করা হয় না। এক্ষেত্রে আমদানিকারকের প্রতিনিধি নিজেই নমুনা পরীক্ষাগারে নিয়ে যান এবং নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট কাস্টমস হাউজে দাখিল করে। অপরদিকে পরীক্ষাগারগুলোর সাথে যোগসাজস করে আমদানিকারকের প্রতিনিধি বেশিরভাগক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে থাকে।

৩.১৫ ফরমালিন আমদানিতে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব

ফরমালিন আমদানি শর্তযুক্ত পণ্যের তালিকায় থাকলেও আমদানির পরে এটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পরিবীক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থা নেই। ফরমালিন আমদানির অনুমতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যের সার্টিফিকেট, ব্যাংক সাটিফিকেট ইত্যাদি জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অবৈধভাবে দালাল চক্রের সহায়তা এবং আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে ফরমালিন আমদানির সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়। আবার ফরমালিন আমদানির পর তা কী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তা মনিটরিং করার ক্ষেত্রে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

৩.১৬ নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম শহর বা মহানগরকেন্দ্রিক হওয়া

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য অংশীজনের (বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ) নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম বেশিরভাগক্ষেত্রেই মহানগর কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ। উপজেলা বা গ্রাম পর্যায়ে এ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম খুব বেশি দৃশ্যমান নয়। এছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমও প্রায়শ শহর কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অপরদিকে বিএসটিআই ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রমও বিভাগীয় শহরকেন্দ্রিক। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন যেমন- কনজিউমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), স্থানীয় বাজার কমিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি রয়েছে।

৪. পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৪.১ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব

বিএসটিআই'র কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার ব্যতিত প্রতিটি পরীক্ষাগারেই (পিএইচএল, পিএইচএফএল, কাস্টমস হাউজ ল্যাবরেটরি) খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। বর্তমানে এ পরীক্ষাগারগুলোতে যেসব যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে শুধুমাত্র খাদ্যপণ্যের সাধারণ পরীক্ষাসমূহ অর্থাৎ খাদ্যপণ্যটি ভেজাল অথবা ভেজালমুক্ত এটি জানা সম্ভব হয়। এছাড়া পরীক্ষাগারে খাদ্যপণ্যের নিয়মিত পরীক্ষা অর্থাৎ কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টক্সিন এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪.২ কাজের চাপ অনুযায়ী জনবলের অভাব

প্রতিটি পরীক্ষাগারেই কাজের চাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি (পিএইচ এল) তে প্রতিমাসে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে প্রায় ৭০০-৮০০ এর মতো নমুনা জমা হয়। পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য এ ল্যাবরেটরির মৌলিক পদ হচ্ছে নয়টি (একজন পাবলিক অ্যানালিস্ট, দুইজন প্রধান সহকারী এবং ছয়জন ল্যাব সহকারী)। জনবলের অপ্রতুলতার কারণে এ ল্যাবরেটরিতে প্রতিমাসে ৩০০-৪০০ নমুনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। অপরদিকে বিএসটিআই'র ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটি প্রয়োজনীয় জনবলসম্পন্ন হলেও বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগারগুলোতে জনবল সংকট রয়েছে। এরফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত নমুনার একটি বড় অংশ তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ- চট্টগ্রামের বিএসটিআই'র পরীক্ষাগারে শুধুমাত্র খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিমাসে প্রায় ৫০০টির বেশি নমুনা জমা হয় কিন্তু জনবল সংকটের কারণে তারা ১৫০টির বেশি নমুনা পরীক্ষা করতে পারে না

৪.৩ টেকনিক্যাল পদগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা

বিএসটিআই ব্যতিত অন্যান্য তিনটি পরীক্ষাগারে টেকনিক্যাল পদগুলোতে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ- নমুনা পরীক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরির মৌলিক দুটি পদ হচ্ছে যথাক্রমে অ্যাসিস্টেন্ট অ্যানালিস্ট ও মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট (ল্যাবরেটরি)। এই পদ দুটির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সায়েন্স গ্রাজুয়েট বা হেলথ টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। এখানে নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা এ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনা করা হয়নি। এর ফলে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলো হতে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস বা ল্যাবরেটরি কারিগরী বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। ফলে নিয়োগ পরবর্তীতে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪.৪ খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রেরিত নমুনা জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে পাঠানোর সাত দিনের মধ্যে সনদ প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল স্বল্পতার কারণে নমুনা পরীক্ষায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরী হয়। অপরদিকে পরীক্ষাগারগুলোতে পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরুপনের জন্য আন্ত:পরীক্ষাগার ক্রস চেকিং এর ব্যবস্থা নেই। এর ফলে পরীক্ষাগারগুলোর দক্ষতা ও পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা নিরুপণ করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বিএসটিআই এর কেন্দ্রীয় ল্যারেটরিতে ক্রসচেকিং এর ব্যবস্থা আছে।

৪.৫ বন্দরগুলোতে পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও পরীক্ষাগার সচল না থাকা

দেশে আমদানিকৃত খাদ্যজাত দ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে প্রবেশ করে । আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও বেনাপোল কাসটমস হাউজের অধীনে দু'টি পরীক্ষাগার আছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের পরীক্ষাগারটিতে খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। অপরদিকে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি গবেষণাগার ভবন নির্মাণ করা হলেও এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও জনবল নিয়োগ করা হয় নি। বর্তমানে পরীক্ষাগার ভবনটি কাস্টমস হাউজের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪.৬ খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

পরীক্ষাগারগুলোতে খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজস লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, তাই পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক সময় নমুনা পরীক্ষা না করে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে (ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি) সনদ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগারগুলোর পাবলিক অ্যানালিস্ট পরীক্ষিত দ্রব্যের পয়েন্ট কমিয়ে বা বাড়িয়ে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। আবার বিএসটিআই কর্তৃক শিল্পজাত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসার ও কোম্পানিগুলোর মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে থাকে। অপরদিকে মাঠপর্যায়ে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরাও নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। তারা খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে যদি নেতিবাচক রিপোর্ট আসে তাহলে মামলা করার ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে থাকে এবং পরবর্তীতে পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগসাজসে নেতিবাচক রিপোর্টকে ইতিবাচক হিসেবে সংগ্রহ করে।

৫. নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ

- মাঠ পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা খাদ্যপ্রস্তুতকারী (যেমন- রেঁস্তোরা, বেকারি) ও ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতা পরিদর্শনে ঘুষ গ্রহণ।
- মাসিক ভিত্তিতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টও কর্তৃক বড় দোকানদার, রেঁস্তোরা ও বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতামূলক দুর্নীতি।
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা আইনের ভয় দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ না করে নমুনা সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত নমুনা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহার করে থাকে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কিছুসংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রমে নিজ উদ্যোগে সোর্স নিয়োগ দিয়ে থাকে এবং সোর্সদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের খরচও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করে থাকে।
- বিএসটিআই'র ফিল্ড অফিসার কর্তৃক খাদ্য কারখানা পরিদর্শণে খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহে ঘুষের বিনিময়ে শিথিলতা প্রদর্শণ
- জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মাঠ পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের যোগসাজস ও নমুনা পরীক্ষা না করে ঘুষ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সনদ প্রদান
- আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষাগার হতে সনদ গ্রহন

জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ধরন	প্রতিষ্ঠান	ঘুষের ক্ষেত্র	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ক্ষুদ্র খাদ্য প্রস্তুতকারী ও খুচরা বিক্রেতা পরিদর্শন	২০০-৪০০*
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	মাসিক ভিত্তিতে রেঁস্তোরা, বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতা	৫০০-১০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	ছোট বা মাঝারী খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	৫০০০-১০০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	বড় খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	পরিমাণ নিরূপণ করা যায় নি
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টমস হাউজ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার	আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা	১০০০-১৫০০
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টমস হাউজ	কাস্টমস হাউজ নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল	৫০০-৮০০

(সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে)

* উপজেলা/জেলা/মহানগর পর্যায়ে একটি খাদ্য ব্যবসা/দোকান/কারখানা পরিদর্শন করতে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা উপরোক্ত হারে ঘুষ গ্রহণ করেন। সুতরাং তাদের আওতাধীন সকল খাদ্য স্থাপনা থেকে এক মাসে আদায়কৃত মোট ঘুষের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

৬. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

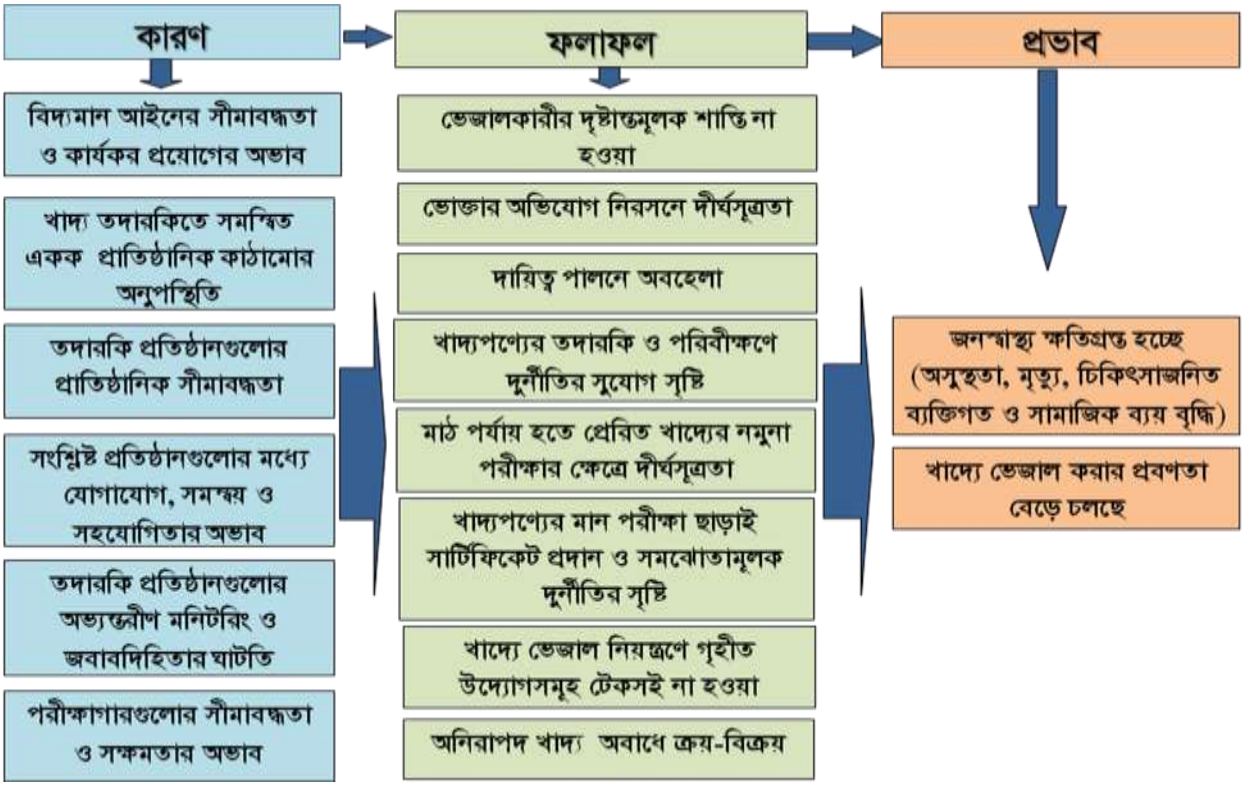

৭. সুপারিশ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত, টেকসই করা এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হচ্ছে:

আইনি কাঠামো সংক্রান্ত

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ নিম্নোক্ত সংশোধনী এনে তা দ্রুত বলবৎ করতে হবে-
   - প্রতিটি জেলা ও মহানগরে এক বা একাধিক খাদ্য আদালত গঠন
   - ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করা
   - ভোক্তা কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার রহিত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে বহনের বিধান করা
   - সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা

২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে-
   - ভোক্তার সরাসরি মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা
   - বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্টেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতা রাখা

৩. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা সংশোধনী আনতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যেমন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কিত

৫. নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক তদারকির জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অতিসত্ত্বর 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে।

৬. পরিদর্শকদের কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দিতে হবে এবং বিদ্যমান ফাঁকা পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে।

৮. খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. খাদ্য তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শণ কাজে গতি আনতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।

১২. জেলাপর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রমকে বেগবান করতে হবে এবং আইনে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

১৩. মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে কর্মরত পরিদর্শকদের (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফিল্ড অফিসার, খাদ্য পরিদর্শক) জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অন্যান্য অংশীজনের (যেমন - সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি, সাংবাদিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

১৫. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি' ও বেনাপোল স্থলবন্দরের পরীক্ষাগারটিতে জনবল নিয়োগ দিয়ে দ্রুত চালু করতে হবে।

১৬. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে।